যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা কোন দেশকেই দমাতে পারেনি, বাংলাদেশকে পারবে?

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গত সাড়ে তিন দশক ধরে পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক থেকে শুরু করে সিরিয়া, হালের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেও বাতাস দিচ্ছে তারা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই থাবা থেকে বাদ যায়নি আফ্রিকার দেশগুলোও। যখন যেখানে নিজেদের স্বার্থের বিষয় এসেছে, সেখানেই যুক্তরাষ্ট্র নানান কৌশল আর ছলচাতুরি আশ্রয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। জারি করেছে নানা ধরণের স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস আগে জারি করলো ভিসা নীতি। বিশ্বের বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, এটা তারা করেছে নিজেদের স্বার্থে এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তেক্ষেপ করলো। গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা আর সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক ভোটের অজুহাত দিয়ে, বাংলাদেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করলো যুক্তরাষ্ট্র। এর পেছনের গল্প হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভাল নয়। তাই তাদের লক্ষ্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করা।

বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শেষ দু’টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠছে। এখন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নানাভাবে ঘায়েল করছে তৎপর বাইডেন প্রশাসন। নিজেদের দেশের এসব অগণতান্ত্রিক আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। উল্টো নিজের মোড়লিপনা জাহির করে সেসব অপকর্ম ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করছে।

একটু পিছনের দিকে গেলে দেখা যায়, আজকে যে স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞার সংস্কৃতি চালু হয়েছে, এর শুরু হয়েছিল নব্বই এর দশকে এই যুক্তরাষ্ট্রের হাত ধরেই। বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই ‘স্যাংশন পলিটিক্স’ এখন ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জর্জ লোপেজ যুক্তরাষ্ট্রের এই স্যাংশন পলিটিক্সকে নব্বইয়ের দশককে

‘স্যাংশন ডিকেডস’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিশ্লেষকদের দাবি, মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের কথা বলে স্যাংশন দেয়া হলেও বেশিরভাগ সময় ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের অধ্যাপক সায়ীদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন’ এর ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও অনেক দেশ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকে। যেমন ‘সৌদি আরব’। সেখানে মানবাধিকার বা গণতন্ত্র না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র কখনই তাদের নিষেধাজ্ঞা দেয় নি।

একইভাবে যদি আমরা পাকিস্তানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে দেশটি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সেনা হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত। সেখানেও দীর্ঘদিন গণতন্ত্র নেই। তারপরেও পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দেয় না। উল্টো আমেরিকার গণতন্ত্র সামিটে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পাঠায়।

এখন আমরা নির্দিধায় বলতে পারি, আমেরিকা নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য স্যাংশন দিচ্ছে। এক্ষেত্রে কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র, আবার কোথাও সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৯ হাজার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কিছু খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ওই বছরই বাইডেন প্রশাসন বিশ্বব্যাপী আরও ৭৬৫টি নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরমধ্যে ১৭৩টি ছিল মানবাধিকার ইস্যুতে।

যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে, বৈশ্বিক উৎপাদনে সেই দেশগুলোর অবদান প্রায় এক–পঞ্চমাংশ। এই উৎপাদনের ৮০ ভাগ দাবিদার চীন। কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়েই চীনকে দমাতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ চীনের উপর যতো নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক সেগুলো কোন কাজে আসছে না।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত এক হাজার ৯৪৮টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে

রয়েছে সুইজারল্যান্ড ও কানাডা। এপর্যন্ত তারা যথাক্রমে এক হাজার ৭৮২টি এবং এক হাজার ৫৯০টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং তাদের অর্থনীতি অনেক বেশি টেকসই ও মজবুত হয়েছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিলেও সেগুলো শতভাগ কার্যকর করতে পারেনি নিষেধাজ্ঞা দেয়া দেশগুলো। যেসব পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে রাশিয়ায় যাচ্ছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা যারা কার্যকর করবে সেই ইউরোপ নিজেদের স্বার্থে সেটা করছে না। তারা কোনোভাবেই নিজেদের ব্যবসা নষ্ট করতে চাইছে না।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১২টি দেশ, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২২ সালে এসব দেশ রাশিয়ায় কাছে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করেছে। যেগুলোর উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা পণ্য রপ্তানিতে জার্মানি প্রথম এবং লিথুয়ানিয়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইরান ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছিল তিন হাজার ৬১৬টি। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত ও ইসরায়েলের মতো দেশ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বছরের পর এতো নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমেরিকা বা তার মিত্ররা থামাতে পারেনি। একই অবস্থা কিউবা, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও।

মোদ্দা কথা কোন নিষেধাজ্ঞাই এসব দেশের অর্থনীতি ধ্বসিয়ে দিতে পারেনি। বরং বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিকল্প পথের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাশিয়া ও চীন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা ভিসা নীতি নিয়ে আরও সোচ্চার হওয়ার সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের। এখন বাংলাদেশ নিজেদের প্রমাণ করার এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

[redacted]

[redacted]

পরিস্কার নয়। যারা স্বাধীন গণমাধ্যমের কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে- তারা কীভাবে মিডিয়ার বিষয়ে এমন কথা বলে, এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে?” তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন, “ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রতিটি গণমাধ্যম নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিতে চলে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের কল্যাণেই দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্থ বা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেটা দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে।

দীপ আজাদ বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় সে দেশের গণমাধ্যমগুলো সে দেশের দল বা প্রার্থীকে সমর্থন দেয়। এটা তাদের সম্পাদকীয় নীতি। বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যম যদি গণতন্ত্র ধ্বংস বা ব্যহত করার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে সেটিকে আমরা গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করি না। সেটিকে আমরা সংগঠন বা ব্যক্তির মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করি।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন বলেন, “আমরা মনে করি এটি স্বাধীনতারে উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্য আমাদের সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্থ করবে। স্বাধীন মত প্রকাশের এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা বা হস্তক্ষেপ সাংবাদিকদের ভীত করে তুলবে।”

জঙ্গিবাদ বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ করে দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা

নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে শুরু করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ

আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালে জেএমবির ৬১টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এরপর সারা দেশে ছোট-বড় আরও অনেক সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ে গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয়। সেখানে ৫ জঙ্গিসহ ২৯ জনের প্রাণহানি ঘটে।

দুই দশকে এসব হামলার শিকার হয়েছেন খোদ বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশকে জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি ঘোষনা দেন জিরো টলারেন্সের। এটা যে কোন মুখের কথা ছিলো না তা বাংলাদেশ বুঝতে শুরু করেছে। একের পর এক জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান, একের পর এক নৃশংস হামলার পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন জঙ্গিমুক্ত দেশে পরিণত হতে চলেছে।

নানা চড়াই উৎরাইয়ের পর বিশ্বে জঙ্গিবাদ দমনে যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ তার ক্যাপ্টেন বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেশব্যাপী জঙ্গিবিরোধী অভিযানে এই সাফল্য অর্জন করেছে। বৈশ্বিক ইনডেক্সে হাই রিস্কের (উচ্চ ঝুঁকি) দেশ থেকে লো রিস্কের (নিম্ন ঝুঁকি) দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) তত্ত্বাবধানে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করলেও তা যৌথ বাহিনীর ব্যাপক অভিযানের মুখে অনেকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

গোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই)-২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী এর সূচকে বাংলাদেশ তিন ধাপ উন্নতি করেছে। অর্থাৎ দেশে সন্ত্রাসবাদ আরও কমেছে, দেশ নিরাপদ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো করা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারতের চেয়েও জঙ্গি দমনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদ পুরাপুরি নির্মূল না হলেও জঙ্গি সংগঠনগুলোর মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এখনও অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে বেশকিছু জঙ্গি সংগঠন।

পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ সাল থেকে ২০২৩ সাল গত ২২ বছরে সারাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ক প্রায় ২ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৯ হাজারেরও বেশি জঙ্গি। এসব জঙ্গিরা হচ্ছে জেএমবি, নব্য জেএমবি, আনসার আল ইসলাম, হরকত-

উল-জিহাদ হুজি, হিযবুত তাহরির, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৯-২০১৩ সালে, ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মী, ভিন্নমতের ইসলামী মতাদর্শের অনুসারী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং বিদেশীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ দেশে জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছিল। তবে এখনো পুরনো জঙ্গি সংগঠন জএমবি, আনসার-আল ইসলাম ও হুজিবি সংগঠিত হওয়ার সময়ে অনেক জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে। নব্য জেএমবির সর্বশেষ আমির মেহেদি হাসান জন তুরস্কে বসে সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মুখে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাস, হরকাতুল জেহাদের হুমকি ধামকির বিপরীতে বিশুদ্ধ বাংলাদেশ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে। দেশে এখনো পর্যন্ত জেএমবি, শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, জেএমজেবি, হিজবুত তাহরির, হুজি-বি, এবিটি, আনসার আল ইসলাম এবং আল্লাহ দল নামে আটটি জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারের কঠোর ভূমিকার কারণে দেশের জঙ্গিবাদ নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।

বলতে দ্বিধা নেই, জঙ্গিবাদ দমনে ২০১৬ সালে গুলশানে হলি আর্টিজানে হামলার ঘটনার আগে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশের তেমন দক্ষতা ছিল না। এরপর গঠন করা হয় পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট, ডিএমপির কাউন্টার-টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইনভেস্টিগেশন সেন্টার এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ইন্টারসেপশন ইউনিট জঙ্গিবাদ দমনে সরাসরি কাজ করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইনে জঙ্গিদের তৎপরতা ঠেকাতেও সতর্ক রয়েছে এসব বাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।’ এ দেশের মানুষ ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ও তাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করে। শিশুদের জঙ্গিবাদ এবং

সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে রেখে একটি আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখতে হজযাত্রী এবং আলেম-ওলামাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আপনাদের (হজযাত্রীদের) এবং আলেম-ওলামাদের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি যাতে আমাদের শিশুরা এটি থেকে দূরে থাকতে পারে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুত হতে পারে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, যারা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করছে তারা সব ধর্মেই আছে। ‘যদি কেউ মনে করে যে তারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে বেহেশতে যাবে, তা কখনোই হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা বলেননি এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা বলেননি।

তিনি এই কথাগুলো বিশ্বাস করেন বলেনই তার সরকারের প্রথম মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। অপরাধ দমন, অপরাধী শনাক্তকরণ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ, মানবপাচার রোধ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইজরা জেয়ার এতো আবদার কেন?

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইজরা জেয়ার আবদার ও বাংলোদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যৌক্তিক অবস্থান। আবদারটি কী ছিলো? আবদার হলো, তিনি বলছেন বৈঠকে তাঁরা রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় দুপুর তিনটার পরে উজরা জেয়ার সঙ্গে বৈঠকের খবর প্রকাশিত হয়। যেখানে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক

নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারসংক্রান্ত আন্ডার সেক্রেটারির দুটি প্রধান বিষয়ে আলাপ হয়েছে। একটি হলো রোহিঙ্গা সমস্যা ও আরেকটি হলো আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করা। বৈঠকের ঘন্টা দুয়েক পরে বাংলাদেশের মিডিয়ার খবরে ভেসে আসে যে সংবাদ তাহলো- মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ঘোষণা। বুঝতে সমস্যা হয় না, ঘোষিতভাবে এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন ভিসা নীতির ধারাবাহিকতারই অংশ। বলা হয়, এই নীতি মূলত প্রযোজ্য হবে গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর। এরপরে যে প্রশ্নটি সামনে আসে- তবে কী উজরা জায়ার সঙ্গে বৈঠকে এমন কিছু ঘটেছে যা ভিসানীতি কার্যকরের ঘোষণা ত্বরান্বিত করেছে।

প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনায় বসলে সবার আগে যেটি সামনে আসে তাহলো রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইজরা জেয়ার আবদার ও বাংলোদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যৌক্তিক অবস্থান। আবদারটি কী ছিলো? আবদার হলো, তিনি বলছেন বৈঠকে তাঁরা রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তিনি পাশাপাশি এও বলছেন, রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির করতে হবে। এবং পাশাপাশি পাদটীকা হিসেবে যুক্ত করছেন যে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করার আগে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দফতরের দ্বিপাক্ষিক কক্ষে ২০ মিনিটের এ বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট ও নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উজরা জেয়া জানান, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পরিস্থিতি এখনও প্রস্তুত নয়।

আচ্ছা, উজরা জেয়ার যদি মনে হয়, নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পরিস্থিতি প্রস্তুত নয়, সেক্ষেত্রে এককভাবে বাংলাদেশের করণীয় কি? রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা? একটা দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে যে রিফ্যুজি জনগোষ্ঠীকে জায়গা দেওয়া হলো, সাত বছর ধরে তাদের ভালোভাবে টিকে থাকার ব্যবস্থাদি দেখভাল করা হলো, তাদের একার দায়িত্ব সেই জনগোষ্ঠীকে ‘অ্যাবজর্ব’ করে নেওয়া? বাংলাদেশের জন্য সেটা হুমকিরা কিনা, নিরাপত্তাহীনতা আছে কিনা সেসব বিবেচনায় নিবে কে?

জেয়ার সাথে ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমাদের

অগ্রাধিকার হচ্ছে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করা।’

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বরাবরই বলছেন, যদি প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত হয় তবে এ অঞ্চল নিরাপত্তা–হুমকির মধ্যে পড়বে। কারণ, রোহিঙ্গারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান ও মাদক ব্যবসা। রোহিঙ্গারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সদর দপ্তরে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ‘তারা কি আমাদের ভুলে গেছে?’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক ইভেন্ট আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একদিকে রোহিঙ্গাদের জন্য আর্থিক সহায়তা কমছে, অন্যদিকে তাদের প্রত্যাবাসনে ধীরগতিতে বাংলাদেশ উদ্বিগ্ন। রোহিঙ্গা সংকটের একটি টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের নিজ মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বানও জানান তিনি। বাংলাদেশের এই অবস্থানের জন্য কি তাকে চাপে ফেলা যায়? আশ্রয় দিয়ে এতো মানুষের জীবন বাঁচিয়ে বিশ্বমোড়লদের কাছ থেকে এই পরামর্শ কীভাবে মোকাবিলা করবে বাংলাদেশ।

২২ সেপ্টেম্বর জেয়ার সঙ্গে বৈঠকে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অংশ না নিয়ে বিএনপিসহ বিরোধীরা দেশে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। কিন্তু অশান্তি সৃষ্টি না করে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সবার সহযোগিতা জরুরি। এবং প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলেও দৃঢ়তা দেখান। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক এই আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এরপরপরই ভিসানীতি নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ঘোষণা আসে। দুটো ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন তৈরী হয় এই ভিসানীতি সরকারকে প্রত্যক্ষ চাপে ফেলার কৌশল হিসেবে ছিলো কিনা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আভ্যন্তরীণ দুই ইস্যুকে ধরে নিষেধাজ্ঞার আওতায় ফেলার

প্রতিক্রিয়াও সেকারণে ছিলো বেশ কড়া। ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশও জানে কীভাবে নিষেধাজ্ঞা দিতে হয়, ওরা হয়তো তা জানেন না। তাই আগামী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হলে বাংলাদেশের জনগণও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। আমরা দেখতে চাই, দেশের বাইরে থেকেও যেন কোনো চেষ্টা না হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে শুক্রবার বিকেলে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ফলে সেখানে বলা প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি বাক্য স্মরণ রাখা খুব জরুরি। শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশে এখন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের কোনো সুযোগ নেই। আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সংবিধান লঙ্ঘন করে কেউ যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এটি ভুলে গেলে চলবে না। শুধু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কেউ বিকল্প উপায়ে ক্ষমতায় আসতে চাইলে তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

আমেরিকা যাদের বন্ধু, তাদের শত্রুর প্রয়োজন হয়না

সারা বিশ্বে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম ও নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি ও হত্যাযজ্ঞ চলছে। যদি প্রশ্ন করা হয় এর জন্য দায়ী কে,তাহলে সহজভাবেই উত্তর আসবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সেসকল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে এর জন্য দায়ী আমেরিকা।

স্থানীয় আদিবাসীদের নির্মম- নিষ্ঠুর পন্থায় হত্যা করে ইউরোপীয় বেনিয়ারা ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই প্রতিষ্ঠা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । প্রতিষ্ঠা লাভের পর ২৪৭ বছরে এক দিনের জন্যও এ দেশটি বিনা যুদ্ধ বসে থাকেনি। এরা বিশ্বের মোড়ল। মানবতা রক্ষার নামে নিজেরা অস্ত্র ব্যবহার করে। আবার অন্যদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে তা ব্যবহার করার জন্য। এরা যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করে বন্ধুত্বের

মাধ্যমে, তারপর নিজেরদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন ধরণের চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, ছরি ঘুরাতে থাকে বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রের উপর। নিজেদের প্রেস্ক্রিপশানে বন্ধু রাষ্ট্রকে চালাতে থাকে, কথা না শুনলেই শুরু করে যুদ্ধ মিশন। কখনও সরাসরি আবার কখনও অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে সংঘাত জিইয়ে রাখে। নিকট অতীতে আমেরিকার কূটকৌশলে অনেক দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানকে দখল করে রেখেছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি আমেরিকা। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে হটানোর জন্য আফগানিস্তানে তালেবান যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণসহ অস্ত্র- গোলাবারুদ সরবরাহ করতে থাকে আমেরিকা। সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসী সংগঠন আল কায়েদার। একসময় আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

পরবর্তীতে আমেরিকা তালেবানদের নিয়মিত অর্থ এবং অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিলে তাদের সম্পর্কের অবনতি হয়, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আল কায়েদা আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা করে যা আমেরিকা এবং আফগানিস্তানকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। সন্ত্রাস নির্মূলের নামে যুক্তরাষ্ট্র ২০ বছর যাবৎ আফগানিস্তানে সৈন্য মোতায়েন করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্ট’ অনুসারে ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত যুদ্ধে আফগানিস্তানে ১,৭৪,০০০ জন মানুষের মৃত্যু হয় ।

২০২০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবান দোহায় শর্তসাপেক্ষ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে বলা হয় যে ১৪ মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হবে, পরিবর্তে তালিবান চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী “আল-কায়েদাসহ এর কোনো সদস্য, অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে এমন কার্যক্রম করার অনুমতি প্রদান করবে না ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা পারমাণবিক বোমা দিয়ে জাপানের হিরোশিমাতে প্রায় ১,৪০,০০০ এবং নাগাসাকিতে প্রায় ৭৪,০০০ লোককে হত্যা করে। পরবর্তীকালে এ দুই শহরে বোমার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান আরও ২,১৪,০০০ মানুষ। দুই শহরেই মৃত্যুবরণকারীদের বেশির ভাগই ছিলেন বেসামরিক ব্যক্তি।

গৃহহীন জীবন যাপন করছে। প্রশ্ন হলো, ভিনদেশে যেখানে সে দেশের জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সেখানে আমেরিকান সৈন্য কেন থাকবে? কেন এত রক্তপাত ঘটাবে?

এভাবেই আরব বসন্তের নাম করে আমেরিকা নিজেদের বিরুদ্ধাচারণ করা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে গেছে। এক হিসাবে বলা হয় আরব বসন্তের ফলে মাত্র পৌনে দুই বছরে লিবিয়া, সিরিয়া, মিশর, তিউনিসিয়া, বাহরাইন ও ইয়েমেনের মোট দেশীয় উৎপাদনের ক্ষতি হয়েছে দুই হাজার ৫৬ কোটি মার্কিন ডলার।

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কাছে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র রয়েছে। আর তা থেকে ইরাকি জনগণকে মুক্ত করতে সেনা অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র এই অনুমান নির্ভর তথ্যের উপর ভিত্তি করে ২০ মার্চ, ২০০৩ তারিখে মারণাস্ত্র ধ্বংস করার নামে তেলসমৃদ্ধ দেশ ইরাকে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট। হামলায় ২ লাখ বেসামরিক ইরাকিকে হত্যা করে আমেরিকা এবং প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে বন্দি করে পরবর্তীতে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।দখল করে নেয় ইরাকের সকল তেলের খনি।

সাদ্দামকে সরানোর পর ইরাকে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন প্রভিশনাল অথরিটি নামে অন্তর্র্বতীকালীন সরকার গঠন করা হয়। যার প্রধান ছিলেন পল ব্রেমার। এ সময় ইরাকে সেনা ও গোয়েন্দা সংস্থা ভেঙে দেয়া হয়। এছাড়া ইরাকে বহু বছর ক্ষমতায় থাকা বাথ পার্টিকেও সরকার গঠনে অংশ নিতে বাধা দেয়া হয়। এসময় দেশটিতে হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সেনা সদস্য বেকার হয়ে পড়ে এবং সরকার ও প্রশাসনে শূন্যতা তৈরি হয়। নতুন করে মাথা চারা দিয়ে উঠে জঙ্গিবাদ ।

বাস্তবতা হলো, ওই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ২০ বছর পার হয়ে গেলেও ইরাকে আজ পর্যন্ত এখনো মারণাস্ত্র পায়নি যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এই অভিযোগেই ইরাকে হামলা চালানো হয়। দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করে ঝুলানো হয় ফাঁসির দড়িতে। পরবর্তীতে আমেরিকা স্বীকার করে নেয় যে ইরাক হামলা তাদের ভুল ছিলো এবং কোন মরণাস্ত্র ইরাকে ছিলো না।

মধ্যপ্রাচ্য,এর মজুত তেল এবং কৌশলগত জলপথ (সুয়েজ খাল) নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসরাইল-ফিলিস্তিনের দীর্ঘ সংঘাতে ইসরাইলের পক্ষপাতিত্ব করে আসছে আমেরিকা। মূলত আরব দেশগুলোকে চাপে রাখতে ইসরাইলকে সরাসরি সমর্থন দেয় আমেরিকা।

দীর্ঘদিন যাবৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তানকে জঙ্গিবাদের হাব হিসেবে ব্যবহার করে আসছে আমেরিকা। তালেবান কিংবা আল কায়েদার উত্থানে তাদের প্রশিক্ষণে যেভাবে আমেরিকা পাকিস্তানের ভূমিকে ব্যবহার করেছে একইভাবে তালেবান/আল কায়েদার ধ্বংসের জন্যও পাকিস্তানকে ব্যবহার করেছে আমেরিকা। এই সুযোগে বছরের পর বছর পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কিনতে বাধ্য করেছে আমেরিকা। যা পাকিস্তানের সামরিক খাতের বরাদ্দ দেখলেই বুঝা যায়। ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও প্রতিরক্ষা খাতে পাকিস্তানের বরাদ্ধ ছিল মোট বাজেটের ১৬ শতাংশ।

বলা হয়ে থাকে যে, এ পর্যন্ত পাকিস্তানে যত সামরিক শাসক ক্ষমতায় এসেছে সবাই আমেরিকার পছন্দসই ব্যক্তি ছিলেন। পাকিস্তানে কে কখন সরকার প্রধান হয়ে ক্ষমতাসীন হবে আবার কে কখন ক্ষমতাচ্যুত হবে তা অনেকাংশেই আমেরিকার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বক্তব্য থেকেই যা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আমেরিকার নির্দেশনায় চলা পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রপ্রধান তার ক্ষমতার মেয়াদ পুরোপুরি শেষ করে যেতে পারেনি। মূলত নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই আমেরিকা পাকিস্তানের রাজনীতিতে যখন যাকে প্রয়োজন তাকে ক্ষমতাসীন করে আবার যখন ক্ষমতাচ্যুত করে। ফলস্বরূপ পাকিস্তানে দিনের পর দিন রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক টানাপোড়ান চলতেই থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থে এই ভিসানীতি

নতুন এই ভিসা নীতির পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে নিজস্ব আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ। বিশ্ব অর্থনীতিতে চিন, জাপান ও ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্ত অবস্থান মার্কিন প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার জাতীয় অর্থনীতির আকার দিনকে দিন কমছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঋণগ্রস্ত দেশে

পরিণত হয়েছে।

সাম্প্রতিক ইউক্রেন যুদ্ধে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। ফলে তারা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশগুলোকে দমিয়ে রাখার কৌশল হাতে নিয়েছে। তাছাড়া ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে যে সুবিধা আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র সেই সুবিধা বাংলাদেশ দিতে প্রস্তুত নয়। কারণ আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ ভারসাম্যমূলক কূটনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন চাওয়া চরম বাধা।

গত ২৪ মে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন হঠাৎ করেই নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণার প্রায় চার মাসের মাথায় ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এই ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণা জানান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তার বিবৃতিতে উঠে এসেছে যে ভিসা নীতির আওতায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

এই ভিসা নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখীনীতির একটি চমৎকার উদাহরণ। পাকিস্তানে নূন্যত্বম গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকা সত্ত্বেও ২০২১ ও ২০২৩ সালে আমেরিকা কর্তৃক আয়োজিত ডেমোক্রেসি সামিতে পাকিস্তান আমন্ত্রণ পায়। বাংলাদেশকে একবারও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও এর সদুত্তর নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। যেমনটা সৌদি আরবে রাজতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সৌদি আমেরিকার ভালো বন্ধু

স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রণীত সংরক্ষিত ভিসা নীতি বা নিষেধাজ্ঞা জারি কোনো সভ্য দেশের কাজ হতে পারে না। একটি পরাশক্তি দেশের এমন আচরণ দুঃখজনক। তাছাড়া ঘোষিত ভিসা নীতি মানবাধিকারেরও স্পষ্ট লঙ্ঘন। পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীন চলাচল তার রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। বাংলাদেশ-আমেরিকা পরস্পরের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নেই। এ ধরনের ভিসা নীতি সাধারণ যুদ্ধরত দেশগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে।

শেখ হাসিনা সরকার বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ২০০০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উত্থান ঘটেছিল, তা দমনে তাঁর সরকার

নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সন্ত্রাসদমনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের এই উত্থান মার্কিন আগ্রাসী স্বার্থে আঘাত হেনেছে বলেই, তারা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। কারণ তাদের কার্যক্রম থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের বদলে মার্কিন প্রশাসন মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দিতে চাইছে।
এটা স্পষ্টতই বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের অবৈধ হস্তক্ষেপের একটি নিকৃষ্ট নজির। কূটনৈতিকভাবেও এই নীতি অগ্রহণযোগ্য। নানা অপ-তৎপরতার পরও মার্কিন পরাশক্তি যেহেতু বাংলাদেশকে তার নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরাতে পারেনি, সেহেতু ‘অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের’ আড়ালে তারা কার্যত বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্বের দ্বি-মেরু বিভাজনকে সবসময়ই নেতৃত্ব দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ সাম্প্রতিক নানা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বাংলাদেশ তার জোট-নিরপেক্ষ ও স্বাধীন অবস্থান বজায় রেখেছে। আধিপত্যবাদী মার্কিন প্রশাসন কোনোভাবেই এ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছে না।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে আমূল বদলে যাওয়া আজকের পৃথিবীতে তথাকথিত মার্কিন কর্তৃত্ববাদের কোনো ঠাঁই নেই। এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারছে না বাইডন প্রশাসন। বাংলাদেশের মতো একটি মধ্যম আয়ের বন্ধু রাষ্ট্রের বিষয়ে তাদের নতুন ভিসা নীতিটি একদিকে যেমন অমানবিক, তেমনি মার্কিন প্রশাসনের হঠকারিতারও উদাহরণ। এই হঠকারিতা অবশ্য নতুন নয়। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর থেকেই বাংলাদেশ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ড. ইউনুস থেকে শুরু করে র্যাব কর্মকর্তাদের ওপর তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা জারি আর আজকের এই নয়া ভিসি নীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কিন প্রশাসন ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে, যা বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির সুসম্পর্কের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগেও অনেক দেশ মার্কিন ভিসানীতি আমলে নেয়নি

বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ করার জন্য আমেরিকা ঘোষিত নতুন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণা এসেছে শুক্রবার। ঘোষণার পর থেকে বিরোধী দল এটিকে সরকারের ওপর চাপ হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করলেও এই ভিসানীতির আওতায় কারা পড়বে তা এখনও স্পষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, এর আগে যেসব দেশকে এই ভিসানীতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের ‘গ্লোবাল স্ট্যাটাস ভ্যালু’ বাংলাদেশের চেয়ে কম। তারাই এই ভিসানীতি আমলে নেয়নি, বাংলাদেশের শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমেরিকা তার দেশে কাকে ভিসা দেবে না সেই এখতিয়ার তার আছে। সেটা তাদের আভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত।

শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আইন-শৃংখলা বাহিনী, সরকারি ও বিরোধী দলের যেসব সদস্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে খাটো করার চেষ্টা করছে, তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো। বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে ওই ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

এরপরপরই নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশবাসী ভোট দিলে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু বিদেশ থেকেও নির্বাচন বানচালের কোনও পদক্ষেপ জনগণ মেনে নেবে না। তার দল সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। যদি কোনও কারণে নির্বাচন বানচালের কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে যারা উদ্যোগ নেবে, বাংলাদেশের জনগণ তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।

এর আগে আমেরিকা ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলো আফ্রিকার কয়েকটি দেশে। সেসব দেশ হচ্ছে – নাইজেরিয়া, উগান্ডা এবং সোমালিয়া। এসব দেশে কোনটিতে নির্বাচনের আগে কোনটিতে নির্বাচনের পরে ভিসা

তবে এই ঘোষণার সমালোচনা করে তিনি বলেন, বন্ধু দেশ হিসেবে তাদের বুঝার দরকার ছিলো। তারা ঘোষণা না দিয়েও ভিসা না দিতে পারতো। ঘোষণা দিয়ে বিষয়টা পাবলিক করাটা দৃষ্টিকটু, অবন্ধুসুলভ আচরণ। আমাদের সরকার বিরোধীদল কারোর এটি গ্রহণ করা উচিত না, সোচ্চার হওয়া উচিত সবার।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা এটিকে লঘু শাস্তি উল্লেখ করে বলেন, এখন দেখার বিষয় বাংলাদেশ এই ভিসানীতির বিপরীতে করণীয় কী নির্ধারণ করে। এর আগেও একই কারণে নাইজেরিয়া, উগান্ডা, সোমালিয়াকে কেন্দ্র করে ভিসানীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেসব দেশে কী ঘটেছে? কোথাও কোথাও নির্বাচনের আগে, কোথাও নির্বাচনের পরে ভিসানীতি প্রয়োগ করে আমেরিকা। নাইজেরিয়া, উগান্ডা এই সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা করেনি। নাইজেরিয়ার জনগণ যারা আমেরিকায় বাস করে তারা সেখানে বসেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব কথা বলেছে তা ভিসানীতির আওতায় পড়ার মতো হলেও দেশটি কিছুই করতে পারেনি। উগান্ডাতেও তেমন হয়েছে। ফলে এটা তোয়াক্কা না করলেই হয়।

বাংলাদেশের জন্য সেটা অসম্মানজনক কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘যেকোন রাষ্ট্রের স্ট্যাটাসের জন্য এটা সম্মানহানিকর। যে তিনটি দেশের কথা বলা হচ্ছে তাদের চেয়ে রাষ্ট্রের ব্রান্ডিংয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান উঁচুতে। আবার গ্লোবালি বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের ব্র্যান্ডিং ভ্যালু আছে। নাইজেরিয়া-সোমালিয়া- উগান্ডার কাতারে বাংলাদেশকে নামানো হয়েছে এভাবে না ভেবে আমি মনে করি, যে ভিসানীতি নাইজেরিয়া-উগান্ডার মতো দেশ আমলে নিচ্ছে না, সেটা বাংলাদেশ থোড়াই কেয়ার করবে।’

শেখ হাসিনা সেদিন সীমান্ত খুলে না দিলে কী হতো!

২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেখতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেইদিনের তার চোখে

মুখে ছিলো এক অন্যরকম মায়া। ভাষাগত দুরত্বের পরেও মানুষকে কীভাবে কাছে টেনে নিতে হয় সেইদিন তা দেখিয়েছিলেন মানবিক প্রধানমন্ত্রী ও মমতাময়ী শেখ হাসিনা। গত ছয় বছর ধরে তার সরকার যেভাবে লক্ষ লক্ষ নারী শিশু রোহিঙ্গাকে আগলে রেখেছেন, বারবার একটা প্রশ্ন সামনে আসে- কী হতো সেদিন, যদি বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেওয়া না হতো।

রোহিঙ্গা নারীর বয়ানে শোনা যায়- চারপাশে ধোয়া। গুলি। একের পর এক গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে যেভাবে পেরেছি, পালিয়ে এসেছি। আমরা নিঃস্ব।

এই মানুষগুলো তখন এমন আস্থা খুঁজছিলেন, যারা তাদের আবারও তাড়িয়ে দিবে না। রোহিঙ্গাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমদিন কী বলেছিলেন শেখ হাসিনা? উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের থাকার ব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি হয়নি। তিনি বলেন, ‘স্বজন হারানোর বেদনা আমি বুঝি৷ ঘরবাড়ি হারিয়ে যেসব রোহিঙ্গা এখানে এসেছেন, তারা সাময়িক আশ্রয় পাবেন৷ আপনারা যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন, সে ব্যাপারে চেষ্টা চলছে”

একজন রিফিউজির দুঃখ-কষ্ট তিনি বোঝেন। কারণ, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনি এবং তার ছোটবোন শেখ রেহানা রিফিউজি হিসেবে ছয় বছর বিদেশে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্যতম অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত একটি জাতিসত্তার নাম। রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধন কোনো নতুন বিষয় নয়। বিগত চার দশকের বেশি সময় বিষয়টি সাময়িক মনে করা হলেও এখন তা স্থায়ী সমস্যা হিসেবে বিরাট আকার ধারণ করেছে। সেটা বিশ্বনেতৃত্বের অজানা নয়।

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইনে তথাকথিত আরসা নাটকের মাধ্যমে রোহিঙ্গানিধন শুরু হলে পরবর্তী কয়েক মাসে দফায় দফায় সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশ তখন সাগরে ভাসমান রোহিঙ্গা জাহাজকে ফের সাগরে ঠেলে দিতে পারেনি। অনেকে বলতে চেষ্টা করেছেন, এতো মানুষকে আশ্রয় দিয়ে বোকামি করেছে বাংলাদেশ। বলতে চেষ্টা করেছে এতে করে সার্বভৌমত্ব খর্ব হতে পারে। জঙ্গি উত্থানের শঙ্কার কথাও বলেন কেউ কেউ। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছি সেইদিন যদি সীমান্ত খুলে দেওয়ার নির্দেশ শেখ হাসিনা না বলতেন তবে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হতো। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। এছাড়া

রেখেছেন। গত ছয় বছর থেকে ১১ লাখ রোহিঙ্গার ভরণপোষণের দায়িত্ব এভাবেই পালন করে যাচ্ছেন তিনি।

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়্যিপ এর্দোয়ান৷ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর বিশেষ দূত ও হলিউড তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও সহৃদয় নেতৃত্বদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন। দেশে বিদেশে সকল মানবিক সরকার ও বিশিষ্টজন শেখ হাসিনার এ উদ্যোগকে এক কথায় সমর্থন যুগিয়েছে। মানবতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ায় সংবাদ সংস্থা ইন্টার প্রেস সার্ভিস থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে জাতিসংঘের সাবেক দুই মহাসচিব কফি আনান ও বুট্রোস ঘালি এবং ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মার্তি আহতিসারি এই সম্মাননা পেয়েছেন।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি) ১ মার্চ থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্যসহায়তা কমিয়ে মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ১২ ডলার থেকে ১০ ডলার করেছে। পরবর্তীতে ১ জুন থেকে তা ১০ ডলার থেকে কমিয়ে ৮ ডলার করেছে যা হতাশাজনক। রোহিঙ্গারা সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে খাদ্য সংকট বাড়বে এবং ক্যাম্পের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ত্রানকর্মীরা। এদিকে, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে এখন চীনের উদ্যোগে মিয়ানমারের নেয়া পাইলট প্রকল্প, পশ্চিমা দেশ ও দাতা সংস্থার সহায়তা হ্রাস, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আত্তিকরন, রোহিঙ্গা নারী ও স্বেচ্ছায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ, কিছু রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসনে অনীহা সব মিলিয়ে নানামুখী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলছে। পরিস্থিতি যাই হোক, বাস্তবতা হলো, রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে এবং দাতাগুষ্টিকে এই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মানবিক হতে হবে। দ্রুত এই সমস্যা সমাধানে বিশ্ব মানবতাকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মানবিকতা দেখিয়েছেন সেটাকে সম্মান দেখানোর পাশাপাশি এটি বিবেচনায় নিতে হবে যে এই সমস্যা থেকে বের করে আনা বাংলাদেশের একার দায়িত্ব না।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

[redacted]

[redacted]

লাশ হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পরিচালক সাইফুল ইসলাম, বেনীপুর বিওপি কমান্ডার আতিয়ার রহমান,জীবননগর থানার এসআই এস.এম. রায়হান, এসআই সৈকত পাড়, জীবননগর উপজলা স্বাস্থ কমপ্লক্সের চিকিৎসক মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় ভারতের বিএসএফের উপস্থিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর থানা পুলিশ লাশটি নিহতের পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেন। এরপর আইনগত প্রক্রিয়া শেষ নিহত মিজানুরের লাশ দাফনের উদ্দেশ্য তার আত্মীয়-স্বজন এ্যাম্বুলন্সে করে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়ায় নিয়ে যান।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের সক্রিয় হিযবুত তাহরীর

প্রতিবছরই তারা এই আয়োজন করলেও এবারের অনলাইন সম্মেলনের টাইমিং ও উদ্দেশ্য প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, নিষিদ্ধের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও হিযবুত তাহরীরের দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আর পুলিশ বলছে, প্রচারণা থাকলেও বড় নাশকতার সক্ষমতা নেই জঙ্গি সংগঠনটির।

ঢাকার বেশকিছু ব্যস্ততম এলাকায় নতুন করে প্রচারণায় নেমেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর। ডেকেছে অনলাইন সম্মেলনও। সেই সম্মেলনের প্রচারণার পোস্টারে সয়লাব রাজধানীর বিভিন্ন দেয়াল। রাজধানীর পল্টন, সিদ্ধেশ্বরী, বাংলামোটর, রামপুরা, কলাবাগান এলাকার দেয়াল ছেয়ে গেছে নিষিদ্ধ সাংগাঠনের পোস্টারে।

এলাকার লোকজন বলছেন, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর কোন একসময় পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে। তবে কারা কীভাবে লাগিয়েছে তা জানেন না স্থানীয়রা। তবে তাদের শঙ্কা, এভাবে ওরা সংগঠিত হয়ে বড় ধরনের কোন অপকর্ম ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। একটি নিষিদ্ধ সংগঠন চোখের সামনে তাদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এব্যাপারে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘আমি মনে করি না বিষয়টি শুধু পোস্টারিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুলিশের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য যে ইউনিটগুলো কাজ করছে, তাদের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পোস্টার লাগিয়ে যখন কেউ নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। তাদেরকে খুব ক্যাজুয়ালি নেওয়ার কিছু নেই, তারা বিপদজনক।’

এদিকে পোস্টার লাগানোর ১২ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কারা কোথা থেকে এসে পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেলো সে নিয়ে কোন তথ্য নেই থানায়। কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এখনও আমি বিষয়টি অবগত নই। আমি টহল টিম পাঠিয়ে এখনই খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যদি তারা কোনো ধরনের প্রচারণা চালিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনা ঘটার পরে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মধ্য দিয়ে সুরাহা করা যাবে না উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলাজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের অধ্যাপক জিয়া রহমান বলেন, ‘অপরাধ দমনের জন্য প্রঅ্যাকটিভ ও রিঅ্যাকটিভ দুটো পদ্ধতি থাকে। আমাদের এখানে প্রঅ্যাকটিভ উদ্যোগ দেখা যায় না। আমাদের যেনো দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো সিরিয়াসলি দেখা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করে এগুলো থামানো দরকার। ভুলে গেলে চলবে না ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’

২০০৯ সালে সরকার হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বারবার তাদের উপস্থিতি জানান দিতে তৎপর এ জঙ্গি সংগঠনটি। কথিত খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কখনও মিছিল আবার কখনও ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আর আয়োজকরা চিহ্নিত হলেও এখনো তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।